চলমান চিন্তা ও চিন্তার স্থাপত্য : সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের গদ্যভাষা ও দুটি বই সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন

কৌশিক চক্রবর্তী

মহাভারতীয় সঞ্জয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়েছিল ঘটমান বর্তমান—যা একদিন ইতিহাসের দোলমঞ্চের প্রতিমা হয়ে যাবে— তার এক পুঙ্খনাপুঙ্খ ও নির্মোহ আখ্যান বিবৃত করার দায়িত্বভার। যদিও দিনের শেষে প্রশ্নেরা জেগে ওঠে—আপাদমস্তক এক নির্মোহে সত্যিই কি ইতিহাসের প্রতি সুবিচার সম্ভব? পুঙ্খানুপুঙ্খতা কি প্রতিবেদনে জড়ো করে আনেনা অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন তথ্যের ভাণ্ডার?

আমরা মনে করি—সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাস যখন বিবৃত হয়, তখন আবশ্যিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক সুনির্বাচিত পক্ষপাতের। আমাদের পাঠ্য ও চিন্তার বলয়ের স্থানাঙ্ক নির্মাণে যে সঞ্জয়ের আঙুলেরা খেলা করে—তিনি মহাভারতীয় নয়— তিনি আদ্যোপান্ত বাঙালি একজন লেখক—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়—যাঁর লেখায় আমরা পেয়ে যাই আবেগজনিত পক্ষপাতের এক নির্বাচিত সবুজ সিগ্যনাল। আর সেই কারণেই তাঁর প্রবন্ধ আমাদের কাছে ইতিহাসের শিলালিপি হয়ে ওঠে। যা ধ্বংসস্তূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আত্মধ্বংসের সহস্রাব্দে আমাদের আয়নার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

বাঙালি তার স্বভাবগুণে আত্মবিস্মৃতির ভূখণ্ডের অধীশ্বর, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সেই কারণেই, লিখনভঙ্গিমায় বাঙালি বলেও, ভাবনাবিশ্বে আন্তর্জার্তিকতার অধিকারী। তাঁর ভাষাপৃথিবী মগ্ন হয়ে থাকে কবিতায়, দর্শনে, চলমান চিত্রমালায়। অথচ নিছক সাহিত্যে ও সিনেমাতাত্ত্বিক তিনি নন। তাঁর গদ্যপৃথিবী নিরস অ্যাকাডেমিক্‌সের মাড় দেওয়া ইস্ত্রি পোশাকে সেজে ওঠে না; বরং পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ যে কবিদের কলমে রক্তক্ষরণ করে, তাঁদের মুখের ছাপ পড়ে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের গদ্যে। তাঁর সিনেমাদর্শনের ভাষ্য হয়ে ওঠে এই সময়ের আত্মদর্শনের আখ্যান। তাহলে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আসলে কী বা কে? একজন কবিতাদার্শনিক প্রবন্ধকার? নাকি, এক প্রবন্ধভাষী কবিতাকার? সঞ্জয়সখা, বাংলা কবিতার সেই নশ্বর দেবদূত অনন্য রায় চেয়েছিলেন— কবিতা হোক এক চিত্ররূপময় প্রবন্ধ। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় দেখান, আমাদের মতন পাঠকধৃতরাষ্ট্রকে, প্রবন্ধ কেমন করে হয়ে ওঠে রক্তমাংসময় কবিতা।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলা গদ্যের সমস্ত অমর সিগনেচার টিউন চিরকালই কিছু উন্মাদ ও একলা দেবদূতের নশ্বরতায় সংরক্ষিত। সতীনাথ -শ্যামল-কমলকুমার-সন্দীপন-আখতারুজ্জামান-নবারুণ, .. ' ছায়া দীর্ঘতর হয়, ছায়ার এক কোণে

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন জীবনানন্দও। কিন্তু সে পুষ্টি গল্পের, উপন্যাসের, ফিচারের, অথচ প্রবন্ধ গদ্যে, সামগ্রিক বাংলাসাহিত্যের ক্রোনোলজিকাল ইতিহাসে, এ সংখ্যা হাতে গোনা। এ কথা বললে, আমার কাছে এতটুকু অত্যুক্তি হবেনা, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় হলেন গত সহস্রাব্দের শেষতম জন্ম নেওয়া দেবদূত, যাঁর নখের অনবধান আঁচরেও, প্রবন্ধ নিজের স্বতন্ত্র রাস্তা নির্মাণ করে। বলা বাহুল্য, সামান্য দুটি-একটি ছাড়া (সম্প্রতি প্রকাশিত), তাঁর বই আদৌ সুলভ নয়। পাঠক কখনও কখনও পায় তারে, বইমেলায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের টেবিলে, অথবা ফুটপাতের রোদ জল মাখা নশ্বরতায়, পায় নাকো আর। নিষিদ্ধ ইস্তেহারের মতন, তাঁর বইগুলো কখনও কখনও গেরিলা পাঠকদের হাতে হাতে দ্রাঘিমা বদল করে, তাঁর সমস্ত বই এখনও সমগ্র নামক পৃথুল অশ্লীলতায় শরীরবদ্ধ হয়নি—যে কারণে, প্রতিষ্ঠানের ছায়াগরিমায় থেকেও তিনি পাঠকের কাছে আপাদমস্তক অপ্রাতিষ্ঠানিক।

২

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখাপত্র প্রথম পড়ি— ছড়ানো ছিটানো, কিছু পত্র-পত্রিকায়, যার নামও এখন আর মনে নেই। তখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সবে ছেড়ে বেরিয়েছি, আচমকা 'অন্তবর্তী প্রতিবেদন' নামক এক বইযের সাথে আমার দেখা হয়, ২০০২ সালের কলকাতা বইমেলায় 'আলোচনাচক্র' পত্রিকার টেবিলে। এক কপি, জীর্ণ, হরিদ্রাভ, হাল্কা শিরায় রঙের প্রচ্ছদে যোগেন চৌধুরীকৃত বাদামী রঙের তুলিস্কেচ— কী করে যে এক কোণে, আড়ালে বেঁচে ছিল। দাঁড়িয়ে ওলোটপালট করে কিছু এলোমেলো পরিচ্ছেদ পড়া—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়কে আরও একটু রক্তমাংসের করে তোলে। এই বইয়ের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল—"....কিছু পুনরুক্তি-লক্ষ্য করা যেতে পারে। তবে তা আমার মোটামুটি অভিপ্রেতই ছিল। আমি চাই যে আমার পাঠক অন্তত অনুমান করুন, আলোচ্য প্রতিবেদনটি কেন অন্তবর্তী।" টের পাই, শুরু হলো ইন্টারপ্রিটেশেনের এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন আখ্যান—যা এইবার ধীরে ধীরে পথ চলবে, কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মোহনমদির স্বস্তি যে পাঠককে আদৌ দেবে না, কারণ যথার্থ শিল্প নিজেই এখনও যাত্রাপথের কোনো শেষ মাইলফলক দেখে উঠতে পারে নি। ওই বই তাই বরং পাঠকের চিন্তাকে উশ্‌কে দেয়, পাঠককেই তাড়িত করে নিজের মতন করে রাস্তা খুঁজতে। লেখক এই যাত্রায় বড়জোর পাঠকের ন্যাভিগেটর। একইসঙ্গে লক্ষ্য করি, এই বইয়ে উল্লেখের পুনরুক্তি, যারা ইঙ্গিত করবে, লেখকের পক্ষপাত—যা আসলে তাঁর গদ্যকে নিরস তাত্ত্বিক অক্ষরপর্বতের দিকে ঠেলে দেবে না— বরং করে তুলবে কাচভাঙা ফোয়ারা। আমরা এক গদ্যকারের কন্‌ফিডেন্স এবং স্কিলের মুখোমুখি দাঁড়াতে শুরু করি।

কী নেই এই সাড়ে বারো ফর্মার অন্তবর্তী প্রতিবেদনে? তার প্রথম লেখা, মানিক বন্দোপাধ্যায় বিষয়ক —'বিশ্বরূপ দর্শন : নান্দীমুখ' শুরু হয় এমন চারটি বাক্য দিয়ে, যা প্রবন্ধঅভ্যাসী পাঠককে চমকে দেয়। "অনাবৃত হচ্ছে হিরন্ময় পাত্রের মুখ—হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যা পিহিতং মুখম্—আমাদের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে আমরা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। ধন্য বিংশ শতক। তুমি এমন গদ্যকারের

মাতৃ-স্বরূপা। তর্কতীতভাবে আজ মনে হয় যে এখনো পর্যন্ত প্রকৃত বাংলা গদ্য এই লৌকিক তৃতীয় পান্ডবের চোখ থেকেই বিশ্বরূপ চুরি করে আনে। আমরা টের পাই, মানিক বন্দোপাধ্যায় অবশেষে অ্যাকাডেমিক কূটাভাষের জড়তা থেকে মুক্ত হলেন।'

কী নেই এই সাড়ে বারো ফর্মার অন্তবর্তী প্রতিবেদনে? প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার যে খেলা, তা তো পাঠক অহরহ দেখেন এখানে। যেমন এই প্রতিবেদনের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ রচনা—'রাত্রির অবরোধ: ইংগমার বার্গমান'। যা, অনেক পরে, 'বার্গমান বিষয়ক' নাম দিয়ে পুস্তিকার আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়ে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গণে উৎসাহী পাঠকের হাতে হাতে ঘুরবে। এ এমন এক লেখা, যেখানে সূচনা করেন বৃহদারণ্যকোপনিষৎ: প্রথম অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণের এক শ্লোক। তার হাত ধরে ক্রমশ প্রকাশ পান বার্গমান সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখিত ভাষ্যে যিনি—" প্রৌঢ় ও নাস্তিমানের কবি, পার্থিব শূন্যতার সেই নির্বিকল্প স্থপতি।" সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ক্রমশ অ্যানালিটিক্যাল প্রবন্ধের ছকবাঁধা ন্যারেটিভ পেরিয়ে এক নিজস্ব চেতনার বলয় নির্মাণ করেন। একটা সময়ে, বার্গমান বিষয়ক তাঁর অ্যানালিসিস থেকে উঁকি মারে, হাতছানি দেয় সিনেমা বিষয়ক কবিতারা—"মানবপুত্র মানেই উপকথাখ্যাত মিডাস। এমন যে সমাজ, যেখানে শিল্প আজ এক বিগতযৌবনা রক্ষিতা, যে একদা অনেক দীপমালা, অনেক ফুল্লকুসুম দেখেছে।" ক্রমশ উপনিষদ থেকে মার্কস, মার্কস থেকে কাম্যু, কাম্যু থেকে রবীন্দ্রনাথ—বিনির্মিত হতে থাকে বার্গমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ, তাঁর লেখালেখি, তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁর ভাবনাবিশ্ব।

'সত্তর দশক ও চারজন কবি' শীর্ষক লেখায় তিনি ব্যবচ্ছেদ করেন তুষার চৌধুরী-অনন্য রায়-রণজিৎ দাশ-জয় গোস্বামী'র কবিতা। বাঙালি পাঠক, যদিও অধিকাংশই, তুষার ও অনন্যর কবিতার মুখোমুখি দাঁড়ায়ইনি কোনোদিন। এই প্রবন্ধে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যেন বা বাঙালি কবিতাপাঠকের হয়ে এক সামগ্রিক পাপস্খালন করেন। সেরিব্রাল প্রদাহের যে বর্ণমালা— তার বিজ্ঞপ্তি জারি হয় এই গদ্যে।

আর এভাবে, ক্রমশ, পাঠক পার হয়ে যান এক দীর্ঘযাত্রাপথ। সমর সেন-বিষ্ণু দে-ইলিয়ট-অমিয়ভূষণ-ক্রকো-অরসন্ ওয়েলস-বাস্টার কীটন-ঋত্বিক—আমাদের অন্তবর্তী তীর্থবাসনার ভ্রমণ যেন বা সবে শুরু হয় এরপর।

একজন স্বপ্নসন্ধানী গদ্যকারের হাতে কেমন করে গুরুভার বিষয়ও কবিতা হয়ে ওঠে—তার উদাহরণ হিসাবে রাখা যাক, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো: অবিস্মরণীয় প্রস্থান লেখাটির একটি অংশ— "ফ্রাঁসোয়া ত্রুশোর অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন। বাস্তবিক তিনি আজ যখন মৃত্যুর গ্রীবার আড়ালে ওষ্ঠ রেখে স্বয়ং নির্বাক, তখন বলা যায়, ত্রুফো ছিলেন আমাদের মলিন সায়াহ্নের সবচেয়ে আনন্দময় অতিথি, তাঁর চিত্রনাট্যে ধর্মবিশ্বাসের মতন ইন্দ্রিয়ঘন একটি শুদ্ধতার রঙ ছিল ..."

এই বইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখা— "চন্দ্রমল্লিকার মাংস এবং/অথবা দোলমঞ্চে উত্তেজনা' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ক এক স্পষ্টবাদী ও সাহসী শিলালিপি। আমাদের বাংলা কবিতায় আইকন নির্মাণের এক বড় অসুখ আছে। রবীন্দ্রনাথের পর

জীবনানন্দকে আমরা, পড়ি না পড়ি, সেই আইকনের বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়েছিলাম— বলা বাহুল্য, সেই পুরস্কার ছিল মরণোত্তর। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশাকেই সে সুখ অনুধাবন করেছিলেন, সন্দেহ নেই। এই জায়গাটাকেই, তাঁর মিথকে ভাঙতে চেয়েছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। হয়ত সে কারণেই, এমনিতে তাঁর লেখায় যে মায়ালাগা কবিতা-নিসর্গ মাথা তোলে, তা এই লেখায় কিছু বা সংযত। সম্ভবত এই কারণেই যে, এখানে তিনি সেই কবিতা প্রতিমাকেই ভাঙতে চান। আমরা নজর রাখি বরং, কীভাবে এই গদ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে, তিনি ক্রমশ এগিয়ে যান, তাঁর সিদ্ধান্তের দিকে—

১) "শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে আলোচনার অনুরোধ আমাকে যথেষ্ট বিব্রত ও সংকোচগ্রস্ত করে। এজন্য যে তাঁর কবিত্ব বিষয়ে আমি সন্দিহান; বরং উল্টোটাই সত্য। অতিরিক্ত সম্বর্ধিত বলেই আমার আশঙ্কা হয় যে কোন অনাহত মুগ্ধতা বোধহয় আমার জন্য আর অপেক্ষা করে নেই।"

২) "প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ততার জন্ম দেয়, স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষণদীপ্তির। আজকের একজন কবির ক্ষেত্রে নির্মাণের বদলে স্বভাবই যদি ক্রমাগত প্রশ্রয় পেয়ে যেতে থাকে, চিন্তার দুরূহতার বদলে আবেগের সারল্য, তবে তা সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিপন্থী বলেই অনতিকালের মধ্যে স্বরব্যঞ্জনের টুং-টাং ও সত্যেনদত্তীয় বেলেয়োরী আওয়াজ অবসিত হয়ে যায়। ছন্দ ও কথ্যভঙ্গী নিয়ে বিলাস ব্যসনের সদিচ্ছা তাঁকে অসামান্য লোকপ্রিয়তা দিতে পারে কিন্তু ইতিহাস চেতনায় সুগঠিত না হয়ে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিতহীন অন্তঃপ্রেরণা যুদ্ধোত্তর কালের শিল্পে কি শোচনীয় বিপর্যয়ের আমন্ত্রণ জানায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার অসফলতা আমাদের কাছে তার এক মূর্ত দৃষ্টান্তস্থল।"

আর এভাবেই সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ধীরে ধীরে তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিষয়ক এই প্রতিবেদনটি রচনা করেন। কবির প্রতি তাঁর মুগ্ধতার সূচনাবিন্দু থেকেই তিনি তাঁকে ব্যক্তিগত পাঠ বিশ্ব থেকে অপাংক্তেয় করার পদ্ধতিটি চালনা করেন। একটা সময়ে, এই লেখার শেষতম অংশে জ্বলজ্বল করতে তাকে এই সাহসী ঘোষণা—

"মনে হয় এই তো মুহূর্ত; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্য অবিচুয়ারি তবে লেখা যেতে পারে।"

৩

সঞ্জয়ের দিব্যদর্শনের যে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতায় আমি জারিত হই, তা ঠিক একবছর পর, যখন তাঁর বাড়িতে এক রবিবার সকালে তিনি আমার ভিক্ষাপাত্রে তুলে দেন 'নাশকতার দেবদূত'। এই দেবদূতদের অভিমানপুস্তক সাড়ে পাঁচ ফর্মায় আমাদের পাঠাভ্যাসের স্থানিকতার নাশকতাই ঘটাতে থাকে যেন, অতঃপর।

অন্তবর্তী প্রতিবেদনের আগে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখিত আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল— 'ইবলিশের আত্মদর্শন সম্পর্কিত' এবং 'স্থানাঙ্ক নির্ণয়', এ দুটো বইয়ের ক্ষেত্রেই বলা চলে, এখনও তবে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি। অন্তবর্তী প্রতিবেদনের পর আলো দেখে ঋত্বিকতন্ত্রের প্রথম খসড়া। এই সেই বই, যা পরে, আরও দু'বার প্রকাশ পেয়ে পাঠককে আলো দেবে। সেই হিসেবে নাশকতার দেবদূত তাঁর পঞ্চম প্রসব। আমরা

আপাতত তাঁর অনুদিত গদার ও ককতোর দুটি চিত্রানট্যের কথা মাথায় আনলাম না। নাশকতার দেবদূত নামক এই বই (বই কেন, তার ভার ও একই সঙ্গে নাব্যতার কারণে, তাকে গ্রন্থ বলে ডাকা হোক বরং) শুরু হয় 'ভ্রাম্যমাণ নিদ্রা ও সন্ত্রস্ত প্রতিবেদন' দিয়ে—যার মুখবন্ধে একই সঙ্গে আবহ রচনা করেন লুই বুনয়েল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড।

আমরা আরও একবার শিহরিত হই, রহস্য আমাদের ঘিরে ধরে। জাঁ লুক গদার প্রসঙ্গে গীতা ও অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ডের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতির জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। আমরা তাই প্রস্তুত করি নিজেদের—গদ্যভাষার হিরণ্ময় পাত্রের ঢাকনা খুলে, তার মহাজলে ডুব দিই। "ফরাসী এই চলচ্চিত্র-স্রষ্টার পক্ষে প্রজ্ঞান হচ্ছে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অন্তবর্তী স্তর, মেঘমাশ্লিষ্ট সেই যোনিপথ যা রোজনামচাপ্রতিম স্বপ্ন প্রসব করে। কখন ঈশ্বর ছোঁড়ে দীর্ঘতম স্বপ্ন কে বা জানে। আর এই স্বপ্ন-পরিব্রাজনাই তো আমাদের অধিকার, যখন সর্বস্ব যায় বস্তুকামে, আমরা দেখি, তমালতালীরনরাজিনীলা, মৃদঙ্গবাদিনীর প্রস্তরীভূত স্তনোচ্ছাস রক্তমাংসময়। শূন্যতার যে অবতল, পটচিত্র যা বক্ররেখার সৌন্দর্য, সমুদ্র তরঙ্গের যে বিন্যাস ও রতিসুষমা, বেহালায়, সুরবিস্তারে জড়িয়ে থাকা যে শ্রাব্য আয়তন তা সারূপ্যতার কটাক্ষে সম্মতি দেবে?" এমন ধারাভাষ্যের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আর সে কারণেই একটা সময়ে আমাদের সামনে কবিতা ও গদ্য—সমস্ত কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ঋত্বিকতান্ত্রিক। ঋত্বিকের চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর বুৎপত্তি তর্কাতীত। যেন বা অধিকার। তাই, চলচ্চিত্র-বিষয়ক কথাবার্তায় ছেয়ে থাকা এ বইয়ের প্রথম দুটো গদ্য পেরিয়ে তৃতীয়ের মুখোমুখি হতেই উঁকি মারে 'বীজের বলাকা'। আমরা পড়ে নিতে থাকি ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক বিষয়ক এক নতুনতম ডিসকোর্স। আমাদের সামনে পরতে পরতে সে তার রহস্য খোলে। বা এক অর্থে আরও বেশি রহস্যের চাদরে মুড়ে নেয় নিজেকে আর দেখি, কেমন করে দিব্যদার্শনিক সঞ্জয় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েও বারবার গানের মুখড়ার মতন ফিরে আসছেন ঋত্বিকে, অযান্ত্রিকতন্ত্রে, রোঁলা বার্ড-জাঁ জেনে-মায়াকোভস্কি-পামোলিনি-আইজেনস্টাইন জুড়ে থাকা এক বিরাট যাত্রাপথের কক্ষে যে চিন্তা ও চেতনার বিস্তার, তার হাত ধরেই ঋত্বিকতন্ত্র যেন বা পুনর্নির্মিত হতে থাকে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। অনেক পরে, সঞ্জয় মুখাপাধ্যায়েরই অন্য কোন এক গদ্যে আমরা পড়ব—প্রকৃত কবিতা লিপি তা-ই, যেখানে কবির বাঁ-হাত ছায়া ফেলে, অর্থাৎ যেখানে ছায়া রহস্যেরা উঁকি মারে মুহূর্তের আভাসে। অযান্ত্রিক নিঃসন্দেহে ঋত্বিক ঘটকের তেমনই এক প্রকৃত কবিতা লিপি যেখানে তাঁর বাম ও ডান— দু হাতের কররেখা আঁকা রয়েছে। সে কবিতালিপিতায় যেন বা সারা মুখের ছায়া ফেলা প্রতিবেদন—যার নিহিত যন্ত্রণায় চলচ্চিত্রতাত্ত্বিকেরা শুনতে পান স্বয়ং জোয়ান অফ আর্কের যন্ত্রণার ধারাবিবরণী। বলা বাহুল্য, অতিসাধারণ দর্শক-পাঠক, আমরা, আংশিক দৃষ্টিভঙ্গিমার অধিবাসী-ছুঁতে পারিনি সেই যন্ত্রণার মহাকাব্য সঞ্জয়ের প্রবন্ধভাষ্যে সেই ক্ষোভ, সেই খেদ- মাথা চাড়া দেয় বারবার।

"... যা ছিল দৃশ্যশ্রয়ী, হয়তো বা সীমিতভাবে শব্দাশ্রয়ী, ঋত্বিককুমার ঘটক নির্বিকল্পভাবে তাকে চিন্তাশ্রয়ী করে তুললেন। সিনেমা নিজেই হয়ে উঠল একটি ডিসকোর্স। চলচ্চিত্রের মাধ্যমটিকে যে পাঠযোগ্য বয়ানে পরিবর্তিত করা যায়, চলচ্চিত্রের দৃশ্যপর্যায় যে তর্ক ও মতাদর্শের একক হয়ে দেখা দিতে পারে— মননের এবম্বিধ প্রহার পঞ্চাশের শেষে ও ষাটের প্রথমে আমাদের মধ্যবিত্ত রুচিতে অপ্রত্যাশিত ও পরিহার্য মনে হয়েছিল। আরামপ্রদ অবসর বিনোদনের অভ্যস্ত আমরা শিল্পের ফলিত সম্প্রসারণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি।"

ঋত্বিকের এই যন্ত্রণা শুধুমাত্র যন্ত্রের নয়, তা মিশে আছে আমাদের চারপাশের সময়ে—আমাদের বসন্তগুলোও যেন অতিরিক্ত মেদরক্তমাংসের গন্ধময়। তাই 'অভিমান ও সেই শব্দের রহস্য' শীর্ষক লেখায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় টের পান "এখন বাংলাসাহিত্য কিচির মিচির তথা স্কুল- গার্ল কলোকিয়ালিজম এখানে সবুজ ব্লাউজ ও নীলাময় যুবক : ফলাফল কাউবয় রোমান্স, ঠিকে ঝির ঝগড়া, প্রগল্‌ভা ছোনাল, ব্যাপক দোকানদারি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।"

সময়ের এই অন্ধকার, এই ক্লেদসূত্রে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন ঋত্বিক—প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন, বাংলা সাহিত্যের দুই রহস্য পুরুষ-জীবনানন্দ ও কমলকুমার। খুকু গদ্যের বিপরীতে, কাউবয় রোমান্সের বিপ্রতীপে যাঁরা অবিচল নিষ্কম্প পাহাড়ের মতনই দাঁড়িয়ে থাকেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের গদ্যভাষায় জীবনানন্দের কবিতার বিপন্ন বিস্ময় অবিরাম খেলা করে চলে, সে বিষযে কোন সন্দেহই জাগে না। জীবনানন্দের প্রতি তাঁর এক পক্ষপাত আছে, তাও ধরা যায় যদিও বা কখনই পাঠকের কাছে পীড়াপ্রদর্শনকারী হয়ে ওঠেনা। প্রসঙ্গত আমার পড়ে নিতে পারি 'অনিশ্চয়তার উপনিষদ' শীর্ষক জীবনানন্দ বিষয়ক লেখার শেষতম অনুচ্ছেদ— যেন বা কবিতার মতনই শেষ হয়, ভালোবাসার কবির কাছে যেন বা এক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

"আজ বুঝতে পারি, আমৃত্যু, জীবনানন্দের, এক আধুনিক শিল্পীর, তথাকথিত-স্ব-বিরোধিতা আসলে যে কোন আধুনিকের পক্ষেই মৌলিক অধিকার। জীবনান্দকে, বিশেষত সাতটি তারার তিমিরকে শাসন করেছে কোয়ান্টাম বাস্তবের অনিশ্চিত শিল্প-প্রজ্ঞা। রাত্রি: কুমারী মাতা যেমন সত্য, প্রজাতির মহাভারত যেমন সত্য, সাতিটি তারার তিমির তেমনই এক উপনিষদ।"

আবার 'অভিমান ও সেই শব্দের রহস্য' প্রবন্ধে কমলকুমার মজুমদার বিষয়ক আলোচনা তাঁর সশ্রদ্ধ মতামতের শেষে তীক্ষ্ণ সমালোচনাও বুঝিয়ে দেয়, লেখক হিসাবে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের যতই ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাত থাক না কেন, তা কখনই অন্ধত্ব বিষয়ক প্রস্তাবনা নয়। লেখক হিসেবে তিনি নির্মোহ নন, এই কারণেই তাঁর ভাবনা অনুযায়ী যেটুকু সত্যি— তা বলতে তাঁর কলমে সন্ধ্যা নেমে আসে না।

"কমলবাবু—একাকী বিবাহ রজনীর উপকরণ নন, মাস (না মাশরুম) কালচারের ভিড়ে তাঁর দেখা মেলে না—যে কারণে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যে অভিমানবশত: নয়? ...অভিমানের প্ররোচনায় যে দিকে তিনি চলে যাচ্ছেন ক্রমশ, ভাষাতে, লোকাচারগুলির

প্রতি বিপুল আসক্তিতে, তা কি সবসময় কমিউনিকেট করে— 'সুহাসিনীর পমেটম' বা একেবারে এখনকার গল্পে? কমল মজুমদারের সত্য আকাশচারী আমরা প্রস্তর, মাংস ও নিশ্বাস চাই ও সেই সত্য যাকে ছোঁয়া যায়।"

এই বইয়ের শিরোনাম যে লেখাটির শীর্ষনামের সঙ্গে মিলে যায়, সেই নাশকতার দেবদূত' (বা এক্সটারমিনেটিং এঞ্জেল, যাকে দিয়ে শুরু হয়েছিল এই গ্রন্থবদ্ধ ডিসকোর্সটি) এই বইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাণ। মহামতি লুই বুনুয়েল বিষয়ক এই বিস্ময়চিহ্নকে পাঠকের মুল্যায়নের টেবিলে ব্যবচ্ছেদের উদ্দেশে না শুইয়ে দিয়ে, আসুন, হে, সঞ্জয়ের নিজের ভাষায়, "আমরা যারা গ্রন্থকে বিশ্বাস করে গেছি, ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে, জীবনের যৌন একাগ্রতা হারাইনি"— পড়ে নিই, এই লেখার দুটি অংশ। আমাদের চৈতন্য হোক।

১) "বুনুয়েল ভাবতে পেরেছিলেন এমন কিছু প্রতি প্রতিমা যা শুধু কুক্ষিরোম বা উন্মেচিত শ্রোণিযুগ নয়; বাস্তবতার একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ অন্তর্যাতনা। বুনুয়েলের পর থেকে চলচ্ছবি ব্যাখ্যার দায় থেকে মুক্তি পেল। বুনুয়েল হানা দেন আপাতভাবে অন্য মেরু থেকে, এখানে আদ্যঋতু, উত্থিত বিপর্যয় ও গোপন লিপিচিত্র যা প্রতি সাংস্কৃতিক তৎপরতা, হয়ত অধিক। বুনুয়েলকে আমরা নানাভাবে ব্যাখ্যায় করতে পারি। য়েমন্ড দুর্গন্য ন'জন বুনুয়েলকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আমার মনে হয় বুনুয়েল ঠিক ছাব্বিশজন। সাতাশ কেন নয় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে পরিসংখ্যান দালির কড়িগুলোর মত নরম হয়ে যেতে শুরু করে।"

২) বুনুয়েল কাব্যময় চলচ্চিত্র কোনোদিন করেননি। পোয়েটিক সিনেমা তো দাদের মলম। রমেশ সিপ্পিও ব্যবহার করে। কিন্তু বুনুয়েল যখন 'লাজ দর' করছেন বা একই সময় 'কবির রক্ত' করেছেন ককতো, তখন সহর্ষে ইতিহাস জানিয়ে দেয়— যে লেখক কবিতা লেখে কবিতা তাকেই বেশী তাচ্ছিল্য করেছে। বুনুয়েল কবিতার কাউন্টারপয়েন্ট; অধিকতর কবিতা অর্থাৎ কবিতার মাত্রামোচন। সময়ের আশ্চর্য মুখপাত্রী হিসেবে বুনুয়েলের সিনেমা আমাদের বলে দেয় নির্ধারিত সীমারেখা আর সিনেমার নয়, বস্তুত কোন শিল্পেরই নয়।"

পোয়েটিক সিনেমা বিষয়ে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের এই উদ্ধৃত বিবৃতি আমাদের ডিসটার্ব করে, চমকে দেয়। আমরা চাই, এ বিষয়ে নিয়ে তর্ক হোক, কিন্তু লেখক কোথাও তার এতটুকু সুযোগ দেন না। যে কারণে, তাঁর এই ভাবনাটি শুধুই নিছক চমকপ্রদ একটি উক্তি। তবে সম্ভবত আমরা এতক্ষণ যে লক্ষ্য রাখছিলাম-- এ দুটি বইয়ের কোথাও তারকোভস্কি-পামোলিনি-অ্যাঞ্জেলোপৌলোস-এর সিনেমা বিষয়ক কোনো আলোচনা নেই, এবার 'তা কেন', সেই উত্তরও পেয়ে যাই।

৪

'অন্তবর্তী প্রতিবেদন' বইয়ে সাড়ে সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী 'কথাবার্তা' নামক এক অংশ বসে আছে। যেহেতু কোন ইঙ্গিত নেই, এটুকুও স্পষ্ট নয়, এই কথাবার্তা নিজের সঙ্গে নিজের, নাকি কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের লিপিরূপ। এমন রহস্যও অমূলক নয়— এখানে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আদৌ রয়েছেন কিনা, বা থাকলেও তিনি কোন পক্ষে, প্রশ্নপক্ষ

নাকি, উত্তরপক্ষ, আমরা যদিও কৌতূহলী হই, এই কথোপকথনের উত্তরপর্বে, কারণ এখানেই ছড়ানো আছে এমন কিছু অভিমত, এমন কিছু অলোকসম্পাত, যা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সামগ্রিক লেখাভাবনার ওপরেও অনেকটা আলো ফেলে। তাঁর লেখা-বিশ্বের অক্ষ ও দ্রাঘিমা, অর্থাৎ স্থানাঙ্কটি নির্ণয় হয়ে যায়।

"আমি সাধারণত সরলতার বিরুদ্ধে; যে কারণে যুগপৎ কুসুম ও সংবাদপত্রে অনীহা জ্ঞাপন করি। আসলে আমাদের অধিকাংশ লেখার মতই প্রবন্ধেও পাঠক পেয়ে যেতে চায় কমনীয় ...মসৃণ ... স্বাদু শব্দগন্ধ! আর আমার মাথা নীচু হয়ে আসে এই ভেবে যে এমন অননুমোদিত গদ্যলিপি আমি আজও প্রণয়ন করে উঠতে পারলাম না যাতে আমাদের রক্ত পরীক্ষা ও জীবনের অব্যবহার্য কবিতাসমূহ। গড্ডালিকা প্রবাহের আপাপবিদ্ধ সদস্যদের জানাতে চাই —আমি ভালোবাসি উন্নাসিকতা। আমার লেখাকে যারা জটিল ও দুর্গমপ্রায় বলে অভিযুক্ত করেন— বলা ভালো তাদের— আমার কৃত্রিমতা স্বেচ্ছাকৃত; অর্থাৎ মেয়েলি নমনীয়তার পরিহার, এক ধরনের পরিকল্পিত ভায়োলেন্স যাতে চিন্তা প্রণালীর সমতলীয় এবং সরলরৈখিক অবয়ব আহত হতে পারে।"

বলা বাহুল্য, এ ভাবনা, এ গদ্য কখনও জনমনোরঞ্জনী হতে পারে না। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের গদ্য তীক্ষ্ণ মেধা ও অনুশীলনের ফসল। তিনি উল্টোদিকের পাঠকের কাছ থেকে ঠিক সমপরিমাণ প্রজ্ঞা দাবী করেন। যে কাবণে, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যতটা না পাঠকের লেখক, তার চাইতে ঢের বেশি, সম্ভবত, সচেতন কারণেই লেখকদের লেখক হয়ে ওঠেন।

মহাপৃথিবীর এক কবির সূত্রে আমরা জেনেছিলাম— সরোজিনী শুয়ে আছে, তাও আবার একটি নির্দিষ্ট জায়গায়— এইখানে আবার একইসঙ্গে সমান্তরাল সন্দেহরাও ছিল ভাসমান— জানি না যে এইখানে শুয়ে আছে কিনা! এইসংকেতবাক্য, এই জটিলতার গলিপথ দিয়েই কবিতা উঁকি মেরেছিল, আজও মারে। অ্যাকাডেমিক অধিগ্রহণোত্তর বাংলা সমালোচনা গদ্যে আমরা অভ্যস্থ হয়ে গেছি শিল্পের প্রতিমায়। যে কারণে, এই যে সন্দেহ—এই শুয়ে থাকা আর না থাকা—এই ঘটমান ও অঘটের মধ্যেকার অন্তর্বর্তী অযুত সম্ভাবনার মহাকাশ—এর অনুসন্ধানে আমরা বুদ্ধিপাত করেছি।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এই মহাকাব্যেরই যে মুক্তাঞ্চলী রয়েছে, তার পরিব্রাজক।

আমাদের কলার তোলার সময় এসেছে, এই ভেবে, যে তিনি আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষাতে তাঁর সেই পর্যটনের দিনলিপি লেখেন....

তথ্যঋণ :

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়—অন্তবর্তী প্রতিবেদন; আলোচনা চক্র, অক্টোবর ১৯৮৯
নাশকতার দেবদূত; বদ্বীপ, মার্চ ১৯৯৬।